

শিক্ষা বাঁচাতে ছাত্রদের মহামিছিলে উত্তাল কলকাতার রাজপথ



১ সেপ্টেম্বর খাদ্য আন্দোলনের ছাত্র শহিদ দিবসে এ আই ডি এস ও-র ডাকে
কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্লানেডে ছাত্রদের মহামিছিল

এ মিছিল স্বপ্ন বাঁচানোর। এ মিছিল শিক্ষা বাঁচানোর। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ১ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক ছাত্র শহিদ দিবসে এআইডিএসও-র আহ্বানে কলকাতায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ ও মহামিছিল শিক্ষার ওপর নেমে আসা সর্বশাসা আক্রমণকে প্রতিহত করার ডাক দিয়ে গেল।

ভুক্তভোগী মানুষ দেখছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মাধ্যমে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যবসায়ীদের মুনাফা-লুটের পণ্যে পরিণত করেছে। নবজাগরণের চিন্তা ধূলিসাৎ করে চলছে শিক্ষার প্রাণসত্তা ধ্বংসের আয়োজন। নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক মনন। চলছে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের ভয়ঙ্কর যড়যন্ত্র। স্কুলস্তরে সিমেন্টার পদ্ধতি চালু, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দেওয়া, প্রাথমিকে পাশ-ফেল চালু না হওয়া, স্কুলে পরিকাঠামোর নিতান্ত অভাব, শূন্য পড়ে থাকা অসংখ্য শিক্ষকপদ ইত্যাদির কারণে আজ সরকারি স্কুল শিক্ষা চূড়ান্ত বিপর্যস্ত। কেন্দ্রে বিজেপি ও পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন তৃণমূল শাসনে গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। এ রাজ্যে ৯ হাজারেরও বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ, প্রায়

সাড়ে ৬ হাজার স্কুলে ১ জন করে শিক্ষক, বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই ৫৭ শতাংশ স্কুলে, স্কুলছুটির সংখ্যা উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে। স্কুলশিক্ষার পাশাপাশি গভীর সংকটে উচ্চশিক্ষার পরিসরও। চার বছরের ডিগ্রি কোর্স, পরিকাঠামো ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত অভাব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বেহাল অবস্থায় তেলে দিয়েছে। রাজ্যের ৪৬০টি-র বেশি সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজে প্রায় ৫০০০ শিক্ষক-পদ, ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০০-এর বেশি অনুমোদিত পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর তিন মাস কেটে গেছে, এখনও ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা হয়নি। কলেজের গভর্নিং বডিতে শাসকদল বিজেপির বিধায়ক-সাংসদদের বসিয়ে দলতন্ত্র ও খ্রেট কালচারের পরিবেশ কায়ম করা হচ্ছে আগের মতো করেই।

সম্প্রতি এনটিএ পরিচালিত নিউ-এর প্রশ্ন ফাঁসে ২২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়েছে। গত ১০ বছরে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে ১৫২ বার। এর বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবদের দেশজোড়া দুর্বীর আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতা প্রবল ধিকৃত হয়েছে। এ দিকে রাজ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে চলছে এবিভিপি-র গেরুয়া

চারের পাতায় দেখুন

মহান মাও সে তুং স্মরণে

“একটি মহান বিপ্লবকে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন একটি মহান পার্টির এবং অসংখ্য প্রথম শ্রেণির কর্মীর। যদি বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকে একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গ্রুপ, এবং যদি পার্টি-নেতারা ও কর্মীরা হন সংকীর্ণমনা, অদূরদর্শী ও অযোগ্য তা হলে ৪৫ কোটি লোকের চিনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই বিরাট বিপ্লবকে সার্থক করে তোলা অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরেই চিনা কমিউনিস্ট



জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩
মৃত্যু : ০৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

পার্টি একটি বড় পার্টি, এবং প্রতিক্রিয়ার যুগে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এখনও এটি একটি বড় পার্টি। এ পার্টির অনেক ভাল ভাল নেতা এবং কর্মী আছে, কিন্তু তবুও তা যথেষ্ট নয়। আমাদের পার্টি সংগঠনকে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত করতেই হবে এবং উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্য নিয়ে হাজারে হাজারে কর্মী এবং প্রথম শ্রেণির নেতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাঁদের অবশ্যই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে সুশিক্ষিত, রাজনৈতিক ভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কাজে উপযুক্ত, আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্বুদ্ধ, নিজে নিজেই সমস্যার মোকাবিলায় সমর্থ, বিপদে ধীর ও স্থির, এবং দেশ, শ্রেণি ও পার্টির

তিনের পাতায় দেখুন

পরিকল্পনাহীন নগরায়ন এবং উষণ্যনের দায় কম নয়

নেপালের বিশ্বংসী বন্যায় অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এবং বিপুল পরিমাণে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, নদীবাঁধ ধ্বংস হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা একটি হিমবাহের সামনের দিকের একটি বিরাট অংশ

নেপালে বিশ্বংসী বন্যা

ভেঙে গিয়ে নুড়ি-পাথর সহ প্রায় ১২০০ মিটার নিচে নদীখাতে আছড়ে পড়ার ফলেই এই বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যদিও বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মনুষ্যসৃষ্ট বিশ্ব-উষণ্যনের ফলে হিমবাহের গলন ত্বরান্বিত হওয়া ও ক্রমাগত ক্ষয় পাওয়া হিমবাহের ভাঙনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

বন্যাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও এর ফলে যে ভয়াবহ ক্ষতি হয়, তার পিছনে মনুষ্যসৃষ্ট

কারণ রয়েছে। প্রথমত, অনেক জায়গাতে নদীর একেবারে ধারে, এমনকি নদীখাতের ওপরেই ব্যাপক ভাবে বাড়িঘর, হোটেল ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। মানুষের বাসস্থান যদি নদীখাতের অনেক উপরে উন্নীত হয়, তা হলে বন্যা হলেও এত বাড়িঘর ধ্বংস হত না। এত মানুষের মৃত্যুও হত না। অপরিবর্তিত নগরায়ন জমিটালের স্থায়িত্ব নষ্ট করে ভূমিধসের প্রবণতা বাড়িয়েছে ও নানা ভাবে পরিবেশের ক্ষতি করেছে। দ্বিতীয়ত, যে ভাবে পরিবেশের তোয়াক্কা না করে, পাহাড় কেটে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, টানেল খোঁড়া হচ্ছে তাতে জমিটালের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে প্রায়শই ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। ভূমিধসের ফলে পাথর, দুয়ের পাতায় দেখুন

বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে

২০ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের নয় সদস্যের বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন, ‘শিল্প’ বা ইন্ডাস্ট্রি-র সংজ্ঞা বিজেপি সরকার প্রণীত নতুন শ্রমকোডের সাথে মিলিয়ে করতে হবে। ফলে ১৯৭৮ সালে বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ারের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের বেঞ্চ ‘শিল্প’-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে যে রায় দিয়েছিলেন তা আর চলবে না।

সাম্প্রতিক এই রায়ের ফলে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক শিল্প বিরোধ সংক্রান্ত রক্ষাকবচের বাইরে চলে গেলেন। বর্তমান বিশ্বায়ন ও উদার অর্থনীতির সময়ে সরকারি উদ্যোগ কার্যত সীমিত। সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রও চলে আসছে বেসরকারি পুঁজির আওতায়। এই সময়ে শিল্পের সংজ্ঞা বদলে দিলে বেসরকারি পুঁজি পরিচালিত হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মী বা বেসরকারি এজেন্সির নিযুক্ত শ্রমিকরা শিল্প বিরোধ সংক্রান্ত কোডের আওতার বাইরে চলে যাবেন।

১৯৭৮-এ ‘ব্যাঙ্গালোর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুর্যারেজ বোর্ড বনাম রাজাঙ্গা’ মামলায় বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ারের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের সাত বিচারপতির বেঞ্চ ১৯৪৭-এর শিল্প বিরোধ আইনের ২(জে) ধারার ব্যাখ্যাকে বিস্তৃত করে শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণে ‘ট্রিপল টেস্ট’-এর দিকনির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কোনও কার্যক্রম যদি ব্যবসা বাণিজ্যের মতো সংগঠিত হয়, নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ হয়, মানুষের যে কোনও প্রয়োজন, তৃপ্তি বা ইচ্ছা পূরণের উপযুক্ত পণ্য বা পরিষেবা উৎপন্ন করে, তাকেই বলা হবে শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রি। এই সংজ্ঞার ফলে কারখানা ছাড়াও স্কুল, হাসপাতাল, চ্যারিটেবল ট্রাস্ট পরিচালিত নানা পরিষেবা, স্থানীয় প্রশাসনের বিরাট সংখ্যক শ্রমিক এমনকি ঝাড়ুদার, অশিক্ষক-কর্মী, স্বাস্থ্য-কর্মীদের মতো বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা ‘শিল্প’-এর সংজ্ঞার আওতায় এসেছিলেন। গত পাঁচ দশক ধরে এর ভিত্তিতে অধিকার আদায়ে তাঁরা লড়াইতে পেরেছেন।

কংগ্রেস সরকার ১৯৯০-এ বিশ্বায়ন, উদারিকরণের নীতি এনে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা শুরু করেছিল। সম্প্রতি উদারিকরণের রাস্তাতেই বিজেপি সরকার সমস্ত শ্রম আইন বাতিল করে যে চারটি শ্রম কোড এনেছে তাতে শ্রমিক-কর্মচারীদের দর কষাকষির অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা ও মালিকপক্ষের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনে ধর্মঘট করার অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনিতেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় মালিকপক্ষের

‘শিল্প’ সংজ্ঞায় বদল

দিকেই থাকে রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব। সরকার, আমলাতন্ত্র, প্রশাসন থেকে শুরু করে বিচারব্যবস্থা পর্যন্ত মূলত মালিকদের স্বার্থেই কাজ করে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হল, ১৯৭৮-এর সংজ্ঞার বোঝা না চাপিয়ে শিল্পের নতুন সংজ্ঞা ২০২০-র শ্রমকোডের চেতনা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী করতে হবে। বিজেপি সরকারের নতুন শ্রমকোডের চেতনা কী তা শ্রমিকরা জানেন। তা হল, শ্রমিককে কার্যত কোনও অধিকার ছাড়াই মুখ বুজে খেটে যেতে হবে। কারণ শাসকের মতে, এটাই হল শিল্পের জন্য আদর্শ শর্ত! এই শ্রমকোড শ্রমিককে এমনিতেই কোণঠাসা অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিচারব্যবস্থার একাংশ থেকেই কথা উঠেছে, বিচারপতি আয়ারের শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার রায় নাকচ হয়ে গেলে মালিকের পাশেই ভারী হবে। দেখা যাচ্ছে, নয় বিচারপতির বেঞ্চের তিনজন এই রায়ের বিপক্ষে মত দিয়েছেন। বিশেষত বিচারপতি নাগরত্বা তাঁর আলাদা রায়ে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষার প্রশ্নটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে ‘হতাশাজনক’ বলে অভিহিত করে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ২২ আগস্ট এক বিবৃতিতে ১৯৭৮ সালের বিচারপতি আয়ারের রায়কে ‘যুগান্তকারী’ হিসাবে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, নতুন ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০-র ক্ষেত্রে পাঁচ দশক ধরে চলে আসা শিল্পের সংজ্ঞাটি প্রযুক্ত না হলে এবং তা শ্রম কোডের ২(পি) ধারাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে শ্রমিকদের একটি বিশাল অংশ যে আইনি ও ন্যায় অধিকার ভোগ করে আসছেন, তা ক্ষুণ্ণ হবে। যে কোনও অজুহাতেই হোক না কেন, নাগরিকদের অধিকার খর্ব করে এমন আইন বা আদালতের রায় নিশ্চিতভাবেই অগণতান্ত্রিক। এই রায় বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে ‘শিল্প’-এর সংজ্ঞার আওতার বাইরে ঠেলে দিল এবং তাদের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী ও শ্রমিক-বিরোধী কঠোর ‘আইআর কোড’-এর নতুন ব্যাখ্যার শিকারে পরিণত করল।

এআইইউটিইউসি বলেছে, এই রায় দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের ওপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলবে এবং তাদের নির্মম শোষণের মুখে ঠেলে দেবে। শীর্ষ আদালতের এই আপত্তিকর রায়ের বিরোধিতা করা এবং নিজেদের কষ্টার্জিত অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করা ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের সামনে অন্য বিকল্প নেই।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কুলতলির চাষি-মজুরদের সুখ-দুঃখের সংগ্রামী সাথী, বিশিষ্ট জননেতা কমরেড শওকত সরদার ৩০ জুলাই রাতে কুলতলির জালাবেড়িয়ায় চাঁদপুরের নিজ বাসভবনে দীর্ঘভোগের পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সংবাদ পেয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ ও শুভানুধ্যায়ী, দলের জেলা ও রাজ্যের নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজাতা ব্যানার্জী, রাজ্য কমিটির সদস্য অনিরুদ্ধ হালদার, জয়কৃষ্ণ হালদার ও জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন নস্কর সহ জেলা নেতৃত্ব ও গণসংগঠনের কর্মীরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড শওকত সরদার ১৯৭১ সালে কাওরাখালি নকুল-সহদেব হাইস্কুলে শিক্ষকতা করাকালীন কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমরেড মোসলেম সরদারের হাত ধরে কমরেড আমীর আলি হালদারের সাহচর্যে দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় নিজেকে একজন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামে নিয়োজিত হন। কংগ্রেসি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে বাড়ির ধান-চাল, এমনকি নিজের জমি বিক্রি করে দিতেও পিছপা হননি। ফলে এলাকায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে খেটে খাওয়া মানুষের আপনজন হয়ে ওঠেন। দলের কাজ করতে গিয়ে শাসক দলের সাজানো বহু মিথ্যা মামলা ও অত্যাচারের শিকার হন। কংগ্রেস ও সিপিএম আশ্রিত ঘাতকবাহিনী কুলতলির ওই সমস্ত অঞ্চলে বছরের পর বছর সন্ত্রাস চালিয়েছে। তাতে দলের বহু কর্মী খুন হন, বহু কর্মীর ঘরবাড়ি তারা জ্বালিয়ে দেয়। তাঁর নিজের ভাইকেও ওই ঘাতক বাহিনী খুন করে। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন এবং এলাকায় সংগঠনকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান। জীবনের শেষের দিকে এলাকায় চাষিদের নিয়ে বিদ্রোহ আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কৃষি-বিদ্রোহে শ্যালো, সাবমার্সিবল পাম্পে বিদ্রোহের সাময়িক সংযোগের জন্য দীর্ঘ ১০ বছর ধরে লড়াই করে দাবি আদায় করেছিলেন। অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কুলতলি শাখার সভাপতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। কমরেড শওকত সরদারের প্রয়াণে দল এক বলিষ্ঠ সংগঠককে হারাল।

২৩ আগস্ট কুলতলির জামতলা বাজারে কমরেড শওকত সরদারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার শিক্ষক কমরেড গোপাল কয়াল সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন প্রয়াত কমরেডের স্মৃতিচারণ করেন। পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দ কুণ্ডু, সুজাতা ব্যানার্জী, সৌরভ মুখার্জী, রাজ্য কমিটির সদস্য অনিরুদ্ধ হালদার, জয়কৃষ্ণ হালদার, নিরঞ্জন নস্কর, গোপাল সাহু এবং ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ সর্দার।

কমরেড শওকত সরদার লাল সেলাম

নেপালে বিধ্বংসী বন্যা

একের পাতার পর

কাদা, মাটি নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে নদীর জলপ্রবাহকে বিঘ্নিত করছে ও বন্যার সময় জলের সঙ্গে মিশে স্রোতকে বিধ্বংসী রূপ দিচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবিদ্যুতের জন্য যথেষ্ট ভাবে নদীতে বাঁধ দেওয়া। পরিবেশের প্রভূত ক্ষতির কথা বাদ দিলেও অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় বাঁধ ভেঙে বন্যা সৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা থাকে বা উপরের দিকে বন্যা হলে তার সঙ্গে বাঁধভাঙা জল মিশে জলস্রোত ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

ইদানীং পাহাড়ি নদীর গা-ঘেঁষে, কোথাও কোথাও এমনকি নদীখাতের ওপরেও যে ভাবে হোটেল, রিসর্ট, হোমস্টে ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে এবং পর্যটন-ব্যবসার বিকাশের নাম করে প্রশাসনও যেভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতি ও ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে সেসব তৈরির অনুমতি দিচ্ছে, তা-ও অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ রাজ্যের উত্তরবঙ্গে পাহাড়ি নদীগুলির গায়ে এই ধরনের অসংখ্য পর্যটনকেন্দ্র রয়েছে যেগুলি যে কোনও সময়ে অতিবৃষ্টি বা হড়পা বানের কবলে পড়ে বিপর্যয়ের শিকার হতে পারে।

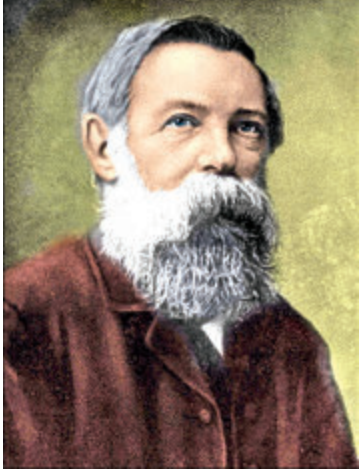
এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নেপালের বন্যা

হিমালয়ের প্রথম দুর্যোগ নয়। এর আগে আমরা কেদারনাথে, উত্তরাখণ্ডে, কাশ্মীরে, সিকিমে হড়পা বানের তগুব দেখেছি। বিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করেন, ঘন ঘন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্য বিশ্ব-উষ্ণায়ন মূলত দায়ী। ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রশমনের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে ভারত সরকারকে বিভিন্ন দিক থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে নিতে হবে। প্রকৃতিতে বিপর্যয় ডেকে আনে, এমন ধরনের প্রকল্প নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ছাড়া, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমানো যেতে পারে যদি দুর্যোগের আগাম সতর্কীকরণের ব্যবস্থাটি পোক্ত থাকে। এর জন্য প্রয়োজন উপগ্রহ চিত্রের চক্ৰিশ ঘণ্টা নজরদারি ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জমির সূক্ষ্ম নড়াচড়াকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্বয়ংক্রিয় ভাবে মাপা ও নথিভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র স্থাপন করা। এ বিষয়ে সরকারকে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি পাহাড়ি নদীর গা-ঘেঁষে অবৈজ্ঞানিক ভাবে যাতে কোনও নির্মাণ না হয়, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখার দায়িত্ব নিতে হবে প্রশাসনকে। বন্যা হয়তো বন্ধ করা যাবে না, কিন্তু তার তীব্রতা এবং ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যই অনেকটা কমানো যেতে পারে, যদি সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও উদ্যোগ থাকে।

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, ‘কনফেশন অফ ফেথ’। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মার্সকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটার



সংবিধানের এবং তার মাধ্যমে চালু হবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক শাসন। ইংল্যান্ডের মতো দেশে, যেখানে ইতিমধ্যে জনগণের অধিকাংশই সর্বহারা, সেখানে এই শাসন হবে প্রত্যক্ষ। ফ্রান্স আর জার্মানির মতো দেশে তা হবে পরোক্ষ শাসন। এই দুই দেশে জনগণের বেশিরভাগ অংশে সর্বহারার সাথে মিশে আছে ক্ষুদ্র কৃষক আর শহুরে পেটি বুর্জোয়া। এরা ক্রমাগত সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে, এবং রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে ক্রমাগত প্রলেতারিয়েতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। সেইজন্য সর্বহারার দাবিগুলি

উপর একটি ভাবনা-চিন্তা কোরো। আমার মনে হয়, এ ভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত ‘কমিউনিস্ট ইস্তাহার’। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্স-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। ৫ আগস্ট এঙ্গেলসের ১৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করছি। এ বার পঞ্চম কিস্তি।

প্রশ্ন : শান্তিপূর্ণ উপায়ে কি ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সম্ভব ?

উত্তর : এমনটা হলে ভালই হত, কমিউনিস্টরা তাতে বাধাও দিত না। কমিউনিস্টরা খুব ভাল করেই জানে, যে কোনও যড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ যে শুধু অকার্যকরী তাই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তারা খুব ভাল ভাবেই জানে, চাইলেই কারও মর্জিমাফিক বিপ্লব ঘটানো যায় না। সবক্ষেত্রে এবং সব সময়ই বিপ্লব হল পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি, যা বিশেষ কয়েকটি পার্টি বা শ্রেণির নেতৃত্ব বা ইচ্ছার উপর একেবারেই নির্ভরশীল নয়।

কিন্তু কমিউনিস্টরা এটাও লক্ষ্য করছে যে, প্রায় সব উন্নত দেশেই সর্বহারাদের বিকাশ গায়ের জোরে দমন করা হচ্ছে এবং তার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধীরা সর্বশক্তি দিয়ে বিপ্লবের পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে। নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণিকে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেওয়া হলে, আমরা কমিউনিস্টরা সক্রিয় ভূমিকায় নেমে সর্বহারার স্বার্থ রক্ষা করব, যে কাজটা এখন আমরা করছি তাদের দাবি ও বক্তব্যকে ভাষা দিয়ে।

প্রশ্ন : ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান কি এক-ধাক্কায় ঘটানো সম্ভব ?

উত্তর : না, সম্পদের উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ যতটা প্রয়োজন, বর্তমান উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে এক ধাক্কায় সেই মাত্রায় বৃদ্ধি করা যেমন অসম্ভব, এটাও তেমনই অসম্ভব। সে কারণে সর্বহারা বিপ্লব, সমস্ত সম্ভাবনাই বলছে যা অবশ্যম্ভাবী, তা পুরনো সমাজকে পাশ্টাবে ক্রমে ক্রমে এবং একমাত্র তখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটানো সম্ভব হবে যখন তা প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে পারবে।

প্রশ্ন : এই বিপ্লবের গতিপথ কী হবে ?

উত্তর : প্রথমেই এই বিপ্লব সূচনা করবে একটা গণতান্ত্রিক

তাদেরও দাবি হয়ে উঠবে। এর জন্য হয়ত প্রয়োজন হবে দ্বিতীয় একটা লড়াই, কিন্তু সে-লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটবে শুধু সর্বহারার বিজয়ে।

সর্বহারার কাছে গণতন্ত্র একেবারেই মূল্যহীন, যদি না তা সাথে সাথে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর নতুন করে সরাসরি আক্রমণের কাজে লাগে এবং সর্বহারার জীবনধারণের উপায় সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে কাজ দেয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে প্রধান পদক্ষেপগুলি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে :

১) ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমাতে তার উপর বর্ধিত হারে কর, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর চড়া হারে কর, জ্ঞতিসূত্রে (ভাই, ভাইপো ইত্যাদি) সম্পত্তি-প্রাপ্তির অবসান, ধনীদেব কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ঋণ (কর) আদায় ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ।

২) ভূস্বামী, শিল্পপতি, রেলওয়ে এবং জাহাজ ব্যবসার রাঘববোয়ালদের হাত থেকে ধাপে ধাপে মালিকানা কেড়ে নিতে অংশত সাহায্য নিতে হবে রাষ্ট্রীয় শিল্পের সাথে তাদের প্রতিযোগিতার, আর অংশত করতে হবে সরাসরি বন্ডের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিয়ে।

৩) সমস্ত দেশত্যাগী ব্যক্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

৪) শ্রমিকের শ্রমকে সংগঠিত ভাবে রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র, রাষ্ট্রীয় শিল্প আর কর্মশালায় নিয়োগ করা। তার মাধ্যমে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানো। যত দিন কারখানায় ব্যক্তিমালিকানা টিকে থাকবে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মতো বর্ধিত হারে মজুরি দিতে বাধ্য করা।

৫) ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সমাজের সমস্ত সদস্যের কাজ করার সমান বাধ্যতা। শিল্প শ্রমিক বাহিনী গঠন, বিশেষ ভাবে কৃষির জন্য।

৬) রাষ্ট্রীয় পুঁজির মাধ্যমে গঠিত জাতীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন আর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা এবং সমস্ত বেসরকারি ব্যাঙ্ক আর ব্যাঙ্কারদের দমন করা।

৭) রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন পুঁজি এবং শ্রমিক যে হারে বাড়ে সেই হারে কল-কারখানা, কর্মশালা, রেলওয়ে এবং নৌপরিবহন শিল্পের বৃদ্ধি, সমস্ত অনাবাদী জমিতে আবাদ এবং ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত কৃষিজমির উন্নতি ঘটানো।

হামবড়া ভাব, কুঁড়েমি, নিক্ষিপ্ততা এবং সংকীর্ণমনা ঔদ্ধত্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং তাঁদের অবশ্যই নিঃস্বার্থ ভাবে জাতীয় ও শ্রেণি-নায়ক হতে হবে।

আমাদের পার্টির সদস্য, কর্মী এবং নেতাদের কাছে এ রকম গুণ ও কাজের পদ্ধতিই পার্টি দাবি করে। যে শত শত প্রথম শ্রেণির নেতা, লক্ষ লক্ষ সদস্য এবং হাজারে হাজারে কর্মী আমাদের আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁরা আমাদের জন্য এই চেতনাগত উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত গুণ

৮) মায়ের কোল ছাড়ার মতো বয়সে এলেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্রীয় খরচে সমস্ত শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা।

৯) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমিতে বিশাল বিশাল ভবন নির্মাণ, যেগুলি হবে শিল্পে এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত নাগরিকদের যৌথ বসবাসের স্থান। সেগুলিতে শহর ও গ্রামীণ উভয় জীবনের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে যুক্ত করতে হবে, যাতে কোনওটার একপেশে প্রভাব কিংবা অসুবিধা নাগরিকদের ভোগ করতে না হয়।

১০) শহর গ্রামের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর এবং বাসের অযোগ্য বাড়ি ও বসতি ভেঙে ফেলা।

১১) বিবাহিত বা অবিবাহিত পিতা-মাতার সন্তান নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর উত্তরাধিকারের সমান সুযোগ।

১২) পরিবহনের সমস্ত উপায়-উপকরণ রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

এ কথা ঠিক, এই সমস্ত পদক্ষেপ একসঙ্গে নেওয়া যায় না। কিন্তু একটি শুরু করলেই পরপর অন্যগুলি নেওয়া সহজ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিমূলে প্রথম বৈপ্লবিক আঘাতটি হানলেই সামগ্রিকভাবে পুঁজি, কৃষিউৎপাদন, শিল্প, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কেন্দ্রীভূত করার কাজে সর্বহারা শ্রেণি নিজেই আরও এগিয়ে চলার আবশ্যকতা বুঝতে পারবে। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি যত বাস্তবায়িত হতে থাকে সামাজিক কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াও তত বাড়ে। সর্বহারা শ্রেণি তার শ্রমের দ্বারা দেশের উৎপাদিকা শক্তিকে যে হারে বাড়িয়ে চলে, সে হারেই বাড়ে এই কেন্দ্রীকরণের গতি। শেষ পর্যন্ত যখন পুঁজি, উৎপাদন, আর বণ্টন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে জাতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে, ব্যক্তিগত মালিকানা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, টাকা হয়ে পড়বে অকার্যকরী। উৎপাদন এতটাই বাড়বে এবং মানুষ এমন ভাবে বদলে যাবে, যাতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কের শেষ চিহ্নটুকুও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : শুধুমাত্র একটি দেশে এই বিপ্লব হতে পারে কি ?

উত্তর : না। বৃহদায়তন শিল্প বিশ্ব-বাজার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত জাতি, বিশেষত সভ্য জাতিগুলিকে এমনভাবে সংযুক্ত করেছে যাতে একটি জাতির জীবনে যা ঘটছে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে অন্যান্য জাতি। তা ছাড়া, বৃহদায়তন শিল্প সকল সভ্য দেশের সামাজিক বিকাশের ধারাকে একসাথে এমন এক স্তরে নিয়ে গেছে, যাতে এই দেশগুলির প্রত্যেকটিতে বুর্জোয়া আর সর্বহারা শ্রেণি হয়ে উঠেছে সমাজের দুই নির্ণায়ক শ্রেণি। আর তাদের মধ্যে সংগ্রামটা হয়ে উঠেছে এখনকার দিনের মুখ্য সংগ্রাম। কাজেই, কমিউনিস্ট বিপ্লবটা এখন শুধু একটা জাতীয় বিপ্লবের আকারে হবে না, এই বিপ্লব একই সাথে ঘটবে সমস্ত সভ্য দেশে, অন্তত ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স আর জার্মানিতে হবে একই সাথে। কোন দেশে শিল্পের বিকাশ, সম্পদ এবং উৎপাদিকা-শক্তির পরিমাণ কী ভাবে বেড়েছে, তার উপর নির্ভর করবে সে দেশে এই বিপ্লবের বিকাশ হবে দ্রুত হারে, নাকি এর গতি হবে ধীর। জার্মানিতে এই বিপ্লবের গতিবেগ হবে সবচেয়ে কম এবং সাফল্য অর্জন করাও হবে সবচেয়ে কঠিন। ইংল্যান্ডে হবে সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে সহজ। বিশ্বজুড়ে অন্যান্য সকল দেশের উপর এর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়বে, তাদের বিকাশের বর্তমান ধারাকে এই বিপ্লব পুরোপুরি বদলে দিয়ে তাকে ত্বরান্বিত করবে দ্রুত হারে। এই বিপ্লব বিশ্বব্যাপী, তাই তার সম্ভাবনাও বিশ্বব্যাপী। (চলবে)

মহান মাও সে তুং স্মরণে

একের পাতার পর

কাজে অনুরক্ত ও আসক্ত হতে হবে। সাধারণ সদস্য ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজে পার্টি এই ধরনের কর্মী ও নেতাদের ওপরেই ভরসা করে এবং জনগণের ওপর তাদের সুদৃঢ় নেতৃত্বের ওপর ভরসা করেই পার্টি শত্রুকে পরাজিত করতে পারে। এ সব কর্মী এবং নেতাদের অবশ্যই স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বীরপনা,

আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন। নতুন ভাবে যাতে আমরা নিজেদের গড়ে তুলতে পারি তার জন্য আমাদের আরও ভাল ভাবে কাজ করা দরকার এবং নিজেদের বৈপ্লবিক মানকে আরও উন্নীত করা দরকার। এটাও কিন্তু যথেষ্ট নয়। পার্টি ও দেশের মধ্য থেকে অনেক নতুন নতুন কর্মী ও নেতা আবিষ্কার করা আমাদের একটা অবশ্যকর্তব্য হিসেবে মনে রাখতে হবে। আমাদের বিপ্লব নির্ভর করে কর্মীদের ওপর। যেমন স্ট্যালিন বলেছেন, ‘কর্মীরাই সবকিছু নির্ধারণ করে।’

(৭ মে, ১৯৩৭-এ প্রদত্ত ভাষণ)

বামপন্থী দলগুলির যুদ্ধবিরোধী মিছিল



১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে বামপন্থী দলগুলির এক মহামিছিল কলকাতার লেনিন মূর্তি থেকে শুরু হয়ে কলুটোলায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের শুরুতে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বাম দলের নেতৃবৃন্দ

যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বিদ্রোহপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ

২৮ আগস্ট যাদবপুর ৮বি-তে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় সমাবেশে বন্দেমাতরম গাইতে এসে যে ভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং বামপন্থী মতাদর্শের বিরুদ্ধে লাগাতার হুমকি, ধমকি ও বিদ্রোহের ভাষা ব্যবহার করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এমনকি একটি বিশেষ সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণাত্মক ভাবে ক্ষমা চাইবার যে কথা বলেছেন তা বেনজির।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুরের মতো রাজ্যের একটি প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ‘বেয়াদব’, ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, ‘আমি পুলিশ মন্ত্রী, আমি জঞ্জাল সাফাই করতে জানি, ক্যাম্পাসে ড্রোন ওড়াবো।’ বামপন্থীদের আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, ‘আমি কমিউনিস্ট সাফাই করেছি।’ তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উ পর নজরদারির হুমকি দিয়েছেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন।

‘ভারতমাতা কি জয়’ স্লোগান তুলে তিনি রাষ্ট্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের নামে বিজেপি-আরএসএসের প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনকে দেশপ্রেমের মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনিই একদিন বলেছিলেন যে, বিজেপির পূর্বসূরি আরএসএস ও হিন্দু মহাসভা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল।

কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তচিন্তা, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসনের উপর এ ধরনের হুমকির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই উস্কানিমূলক, সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ত্রিপুরায়

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, ভঙ্গুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার বসানো, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন, চুরি-ডাকাতি-তোলাবাজি, ড্রাগ ও মাদকের বাড়বাড়ন্ত, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব ইত্যাদি সমস্যায় বিপর্যস্ত ত্রিপুরার জনজীবন। বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার এ সব বিষয়ে উদাসীন। এর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে ২৭ আগস্ট আগরতলায় ক্ষুদীরাম মূর্তি থেকে



প্যারাডাইস চৌমুহনী পর্যন্ত একটি মিছিল হয়। পরে সেখানে সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুণ ভৌমিক। তিনি বলেন, আন্দোলনই দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ কাজ না হওয়ায় কেলেঘাই নদীতে বছর বছর বন্যা, সরকার উদাসীন

প্রতি বছর বর্ষাকাল এলেই সবং, পিংলা, নারায়ণগড়, ভগবানপুর, পটাশপুর সহ দুই মেদিনীপুরের সাতটি ব্লকের লক্ষ লক্ষ মানুষ কমবেশি বন্যা বিধ্বস্ত হয়। কেলেঘাই হয়ে ওঠে দুঃখের নদী। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সম্প্রতি মাত্র দিন কয়েকের ভারী বৃষ্টি, আর তাতেই কেলেঘাই ও তার শাখা নদী কপালেশ্বরী-বাগুই ভয়ঙ্কর ভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠল। এদের শাখা খালগুলির পাড় উপচে পড়া জলে সমস্ত ব্লকের বহু মৌজা জলমগ্ন হল। অতিবৃষ্টিতে শুধু সবং ব্লকেই প্রায় ৩০ হাজার মানুষ বন্যাকবলিত ও ৩১ হাজার একরের বেশি জমির আমন চাষ নষ্ট হয়েছে। বাকি অন্যান্য ব্লকগুলোতেও ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। বন্যার জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি। প্রতি বছরের মতো এ বছরের বন্যাতেও ভাগচাষি-দিনমজুর-খেতমজুর সহ কর্মহীন হাজার হাজার মানুষের পরিবারে নেমে এসেছে চূড়ান্ত আর্থিক সংকট। বহু পরিবারকে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

কিন্তু বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে এই বন্যা প্রতিরোধ করা কি সত্যিই অসম্ভব?

স্বাধীনতার ৭৯ বছর কেটে গেল। অথচ কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই খরা-বন্যা নিয়ন্ত্রণে আজ পর্যন্ত উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। বরং, যে দল যখনই ক্ষমতায় বসেছে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে তারা বন্যাকে ব্যবহার করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষকে নিয়ে ত্রাণের নামে তারা ভোটের রাজনীতি করেছে। ত্রাণ নিয়ে চলেছে দলবাজিও। সরকারগুলির এ হেন উদাসীনতার বিরুদ্ধে কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই নদীর স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও এদের শাখা খালগুলির জলনিকাশির দাবিতে বানভাসি মানুষদের নিয়ে ১৯৮৬ সালে গড়ে উঠেছিল গণসংগ্রাম কমিটি। দাবি ছিল, মাটির ঢাল অনুসারে কেলেঘাই নদীর প্রবাহকে দক্ষিণমুখী করা। কারণ অনেকবারই বন্যার সময় অতিরিক্ত জলের চাপে আমগেছিয়ায় বাঁধ ভেঙে জলের স্রোতের প্রবণতা দক্ষিণমুখী হতে দেখা গিয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানী ও নদী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা করে তৈরি করা ম্যাপ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও আধিকারিকদের হাতে

একাধিকবার তুলে দেওয়া হয়েছে।

টানা ২২ বছর ধরে লাগাতার আন্দোলনের চাপে গত ২০১১-১২ আর্থিক বছরে নদী সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৬৫০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়েছিল। সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল পর্যায়ক্রমে ৩টি ধাপে ২০১৪ সালের মধ্যে নদী সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ কাজ শেষ করা হবে। কিন্তু দেখা গেল, ২০১২ সালে নদী খননের কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে খানিকটা হলেও প্রকল্পটির পূর্ণাঙ্গ কাজ ১৪ বছর পর আজও শেষ হয়নি। মোট ১৪১ কিলোমিটারের মধ্যে সংস্কার হয়েছিল মাত্র ৫২ কিলোমিটার। তাও ছিল দুর্নীতিতে ভরা দায়সারা কাজ। কিন্তু এই সামান্য সংস্কারেই নিকাশি ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় গত ২০২০ সাল পর্যন্ত অতিবৃষ্টিতে তেমন ভয়াবহ বন্যা হয়নি। এমনিতেই সমতল ভূমির উপর দিয়ে নদী খুবই আঁকা বাঁকা পথে প্রবাহিত। তার উপর অস্বাভাবিকভাবে উত্তরমুখী হওয়ায় নদীর গতি খুবই ধীর। বছরের পর বছর ধরে মোহনায় পলি জমার ফলে নদীর নাব্যতা খুবই কমে গেছে। এর সাথে নানা সময়ে শাসক দলের মদতে নদীখাত দখল করে বা বাঁধ কেটে ভেড়ি, ইটভাটা চলছে। বর্তমান শাসক দলেরও এই সব বেআইনি কাজ বন্ধের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আর এ কারণেই ২০২১ সাল থেকে আবার আগের ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে বন্যা।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গণসংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বার বার সরকারকে জানানো হয়েছে নদীর গতিপথ দক্ষিণমুখী করতে হবে যেমন আগে ছিল এবং শাখা খালগুলিকে নিয়মিত সংস্কার করতে হবে। কমিটি গত ৪ আগস্ট একগুচ্ছ দাবি জানিয়ে সেচদপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েছে।

কেন্দ্র-রাজ্যের ক্ষমতায় সরকার পরিবর্তন বারে বারে ঘটেছে। কিন্তু বানভাসি মানুষদের জীবনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। অসহায় অবস্থায় সামান্য দান খয়রাতির মাধ্যমে এদের নিয়ে চলছে ভোটসর্বস্ব নোংরা রাজনীতি। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দুই সরকারের যৌথ তৎপরতা কোথায়?

শিক্ষা বাঁচাতে ছাত্রদের মহামিছিল

একের পাতার পর

তাণ্ডব ও দখলদারির রাজনীতি।

শিক্ষার বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ সহ এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও এনটিএ বাতিলের দাবিতে, ১৯৫৯ সালের ১ সেপ্টেম্বরের ছাত্র আন্দোলনের শহিদ স্মরণে এ দিন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর দৃপ্ত স্লোগানে মুখরিত হল কলকাতার রাজপথ।

কলেজ স্কোয়ারে এ দিন বেলা ১২টায় শুরু হয় সমাবেশ। হাজার হাজার মনোযোগী ছাত্রছাত্রীর এই বিশাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি ও

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক ও দিল্লি রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্রেয়া সিং, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ কুমার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সহসভাপতি কমরেড চন্দন সাঁতরা, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রশান্ত ভট্টাচার্য।

সমাবেশের পর সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল একটি ছাত্র মহামিছিল ধর্মতলা পর্যন্ত যায় এবং সেখানে কর্মসূচি শেষ হয়।

৩১ আগস্টের শহিদ স্মরণে

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের অমর শহিদ ও ১৯৯০-এর মূল্যবৃদ্ধি ও ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের শহিদ কমরেড মাধাই হালদার স্মরণে ৩১ আগস্ট কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শহিদ বেদিতে মালাদান করে শ্রদ্ধা জানান এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ (পাশের ছবি)।

বিকালে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে শহিদ মাধাই হালদারের স্মরণ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান দলের নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর



বক্তব্য রাখেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাখাকান্তপুরে শহিদ মাধাই হালদারের গ্রামে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মরণ অনুষ্ঠান হয়।

যাদবপুরে বামপন্থী দলগুলির যৌথ কনভেনশন

বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ত্রুণাগত আক্রমণ করে চলেছে সমাজের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ পরিসরকে। কখনও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত রাস্তার নাম পরিবর্তন করে, কখনও তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে অথবা তাঁর মূর্তি ভেঙে দিয়ে তারা চাইছে— মানুষের মধ্যে সগৌরবে বেঁচে থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান লড়াইকে ভুলিয়ে দিতে। একই সাথে তারা চাইছে বিশ্বের শোষিত মানুষের মুক্তিদূত লেনিনের মূর্তি ভেঙে দিয়ে শোষিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ভেঙে দিতে।

এই বেপরোয়া তাণ্ডবের প্রতিবাদে এবং শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে এবং নাগরিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতার উপর লাগাতার আক্রমণের বিরুদ্ধে ২৬ আগস্ট রাজ্যের বামপন্থী দলগুলোর যৌথ উদ্যোগে মিছিল এবং গনকনভেনশন হয়। এ দিন সুকান্ত সেতু ও

পল্লীশ্রী থেকে দুটি মিছিল এসে মিলিত হয় যাদবপুর ৮-বি তে লেনিন মূর্তির কাছে।

এতে সামিল হয়েছিলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট), সিপিএম, সিপিআই(এমএল), সিপিআই, আরএসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী-সমর্থক নেতৃবৃন্দ সহ গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ। এবিভিপি ও আরএসএস-এর বহিরাগত গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর যৌথ প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এআইডিএসও, এসএফআই এবং আইসার প্রতিনিধিরা। সভাপতিত্ব করেন সিপিআইএম-এর কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড কল্লোল মজুমদার।

এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক কমরেড তরুণ কান্তি নন্দার।

দিল্লির গণধর্ষণে কঠোর শাস্তি দাবি এআইএমএসএস-এর

বিজেপি শাসনের ১২ বছরে দিল্লি যে ধর্ষণের রাজধানী হয়েই থেকে গেছে তা আবার দেখিয়ে দিল চলন্ত বাসে এক কিশোরীর গণধর্ষণের ঘটনা। ৪ আগস্ট দিল্লি উপকণ্ঠের গ্রেটার নয়ডা থেকে ১৬ বছরের এক স্কুলছাত্রীকে বাসে তুলে নিয়ে দুষ্কৃতীরা গণধর্ষণ চালায়। ৪৭ কিলোমিটার জুড়ে রাজধানীর বুক বাসটি ছাত্রীকে নিয়ে ঘুরলেও বিজেপি সরকারের পুলিশ আটকায়নি। এই গণধর্ষণের ঘটনা দেখিয়ে দিল উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে বিজেপি শাসনে দুষ্কৃতীরা কতটা বেপরোয়া এবং পুলিশ কতখানি নিষ্ক্রিয়।

এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনা বিজেপি সরকারের ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ স্লোগানের বাস্তব চেহারাটি দেখিয়ে দিল। ধর্ষিতা কিশোরী ও তার পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার জানিয়ে এআইএমএসএস দাবি করেছে, সময় নষ্ট না করে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার করে দুষ্কৃতিদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষিতার মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ও তার ভবিষ্যতের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। অপদার্থতার জন্য দিল্লি পুলিশের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে।

জেএনইউ-তে এআইডিএসও-র সভা

এআইডিএসও দিল্লি রাজ্য কমিটির উদ্যোগে জেএনইউ-তে ২৩ আগস্ট ‘সাম্প্রতিক জেন জি-জেন আলফা আন্দোলন এবং আমাদের কর্তব্য’ শীর্ষক আলোচনা সভা হয়।

প্রথম অধিবেশনে যন্তুর-মন্তুরে অংশ নেওয়া প্রতিবাদকারী ছাত্ররা তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। প্রত্যেকের আবেগদগ্ধ ভাষণে এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাবের বিষয়টি উঠে আসে। আন্দোলনস্থল কী ভাবে কার্যত ছাত্রদের নিজেদের বাড়িঘরে পরিণত হয়েছিল, তা তাঁরা তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে, সংগঠনের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক অজিত পানওয়ার, সংগঠনের দিল্লি রাজ্য সম্পাদক ও সেন্ট্রাল কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক কমরেড শ্রেয়া বন্তব্য রাখেন। বন্তব্যরা ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে



যাওয়ার ক্ষেত্রে যুক্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর জোর দেন।

উজানী আসামের বন্যা মনুষ্যসৃষ্ট

গত ১৯ জুলাই থেকে উজানী আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপে এই বন্যা সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যাগুলির মধ্যে অন্যতম। শিবসাগর, চরাইদেও, জোড়হাট, গোলাঘাট— এই চারটি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। নাগাল্যান্ডের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হওয়ার দিখৌ নদী এবার শিবসাগর জেলার বন্যায় মূল ভূমিকা পালন করেছে। এ ছাড়া নাগাল্যান্ড থেকে আসা ভোগদই ও জাঁজি নদীও এই বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। সরকারি হিসেবে একশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যদিও বাস্তবে সংখ্যাটা কয়েক গুণ বেশি। এ ছাড়াও দেড় লক্ষ মানুষ আক্রান্ত। ক্ষয় হয়েছে তিরিশ হাজারের বেশি বাড়ি ও হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল। বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

প্রশ্ন উঠছে, আসামের এই ভয়াবহ বন্যার কারণ কি শুধুই প্রাকৃতিক, নাকি এতে মানুষেরও ভূমিকা রয়েছে?

নাগাল্যান্ডের পাহাড় থেকে উৎপন্ন ও ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিলিত হওয়া এই নদীগুলি এত ভয়ানক হয়ে উঠল কেন? জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে নাগাল্যান্ডের পাহাড়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে নদীগুলিতে জল বাড়তে থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সতর্কবাণী বা আসন্ন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ কোনও উদ্যোগ ছিল না। ১৯ তারিখে নাগাল্যান্ডের পাহাড়গুলিতে বেশ কিছু ধস নামলে নদীগুলি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়ে।

প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ শৈলেন বড়ঠাকুর ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নদী বিশেষজ্ঞ নয়ন সারমার মত অনুযায়ী এ বারের ভয়াবহ বন্যা মূলগত ভাবে মনুষ্যসৃষ্ট। প্রথমত, দিখৌ নদী সহ প্লাবিত নদীগুলির দুই কূল জুড়ে প্রচুর কয়লা ও পাথর খাদান রয়েছে। নাগাল্যান্ডের পাহাড়ে বিশাল এলাকা জুড়ে র‍্যাট হোল মাইনিং সহ বনভূমি ক্ষয় করা হয়েছে। এর ফলে পাহাড়ে মাটিক্ষয় বেড়ে গেছে এবং পাথর, বালি ও মাটি নদীগুলিতে এসে মিশেছে। সেই কারণে নদীগুলির

জলধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, অবৈজ্ঞানিক ভাবে খননকাজ চালানো ও বনভূমি ধ্বংসের ফলে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে পড়েছে। ফলে ভূমিধস বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয়ত, এই খনিগুলিতে ধস নামার ফলে সেখানে জমে থাকা জল মুক্ত হয়ে নিচে নেমে এসেছে। আসাম সরকারের পক্ষ থেকে শুধু অতিবৃত্তিক কারণ হিসেবে দেখানো হলেও আসল কারণগুলি জনসমক্ষে চলে আসার পরেই শুরু হয়েছে আসাম ও নাগাল্যান্ড দুই রাজ্যের সরকারের একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ। কিন্তু কেন্দ্র সহ এই দুটি রাজ্যই রয়েছে বিজেপির সরকার। তাই এর মাধ্যমে বিজেপির জনগণের প্রতি চূড়ান্ত উদাসীনতাই ফুটে ওঠে।

বন্যার পরেই এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর কর্মীরা উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যাপক অংশের সাধারণ মানুষ ত্রাণ তহবিলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। চাল, ডাল, শুকনো খাবার, জল, সাবান, ফিনাইল সহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী আক্রান্ত মানুষদের দেওয়া হয়। জল নামার সঙ্গে সঙ্গেই স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে ঘরবাড়ি মেরামত ও পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়। বহু সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রী এই কাজগুলিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গায় নানা রোগের প্রকোপ দেখা দিতে শুরু করলে স্বাস্থ্যশিবিরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে ও সহায়তায় নাগাল্যান্ড ও আসামের বেশ কিছু বন্যাবিক্ষস্ত এলাকায় স্বাস্থ্যশিবির করা হয়। ওড়িশা থেকে ডাঃ প্রাজ্ঞ অনিবার্ণ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ডাঃ শাহরিয়ার আলম, ডাঃ বিক্রম মণ্ডল ও ডাঃ রাজ বর্মন ও ক্রিটিকাল কেয়ার প্যারামেডিক মিঠুন মাইতি, আসাম থেকে ডাঃ চিত্রলেখা দাস, ডাঃ কৌশিক ও ফার্মাসিস্ট মিঃ ভাইটি রিশং অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে আসা রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে সেখানকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্দশা নজরে আসে। নাগাল্যান্ডের মন ও টিজিট শহরে মেডিকেল ক্যাম্প করে কয়েকশো বন্যাবিক্ষস্ত মানুষের চিকিৎসা করা হয়।

গ্রেট নিকোবর প্রকল্পে বিপন্ন জনজাতি মানুষের জীবন ও পরিবেশ

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভারত মহাসাগরের বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি। ভারত সরকার এই দ্বীপপুঞ্জে গড়ে তুলছে ৯০ হাজার কোটি টাকার গ্রেট নিকোবর প্রকল্প, যাতে ধ্বংস হবে একটি বিস্তৃত অঞ্চলের অরণ্য ও বাস্তুতন্ত্র, বিপন্ন হবে জনজাতি মানুষের জীবন। প্রশ্ন উঠছে, উন্নয়নের নামে প্রকৃতির এই নির্বিচার ধ্বংস কি সত্যিই উন্নয়ন? এর ফলে আদতে লাভ হবে কাদের, ক্ষতিগ্রস্তই বা হবে কারা?

১৬৬ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ মোট জমির প্রায় ১৮ শতাংশ অঞ্চল জুড়ে তৈরি হতে চলা গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের উদ্দেশ্য একটি সুবিশাল অত্যাধুনিক ট্রান্সপোর্ট বন্দর তৈরি করা। সেখানে পণ্য স্থানান্তরের পাশাপাশি গড়ে উঠবে প্রতিরক্ষা আউটপোস্ট। সেই সঙ্গে তৈরি হবে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, উপনগরী, বিলাসবহুল শহর, পর্যটন কেন্দ্র এবং গ্যাস ও সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র।

অরণ্যবাসী কিছু সংরক্ষিত উপজাতি সহ বহু বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর বাস এই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের প্রকল্প ঘোষণা করায় আতঙ্কিত হয়েছেন নিকোবরের জনগণ থেকে পরিবেশবিদ—সকলেই। উন্নয়নের বকমকে বিজ্ঞপনের আড়ালে পরিবেশ ধ্বংসের কালো ছায়া লক্ষ্য করছেন তাঁরা। সাধারণ মানুষও বারবার এ বিষয়ে সরব হয়েছেন। অভিযোগ উঠছে, এই দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল প্রকল্পটি ঘোষণার আগে পরিবেশবিদ, অর্থনীতিবিদ বা প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া হয়নি। এমনকি আলোচনা করা হয়নি নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গেও। প্রশাসনের তরফে নিকোবরের জনগণকে পুনর্বাসন দেওয়ার একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা তাদের আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি করেছে।

হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলে বাস করছেন ‘শম্পেন’ নামক একটি সংরক্ষিত

উপজাতি। রয়েছেন নিকোবরীরাও। সরকার উপজাতিদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে বললেও আন্তর্জাতিক জনজাতি-বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই প্রকল্পের ফলে শম্পেন উপজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে বহু যুগ ধরে তেমন যোগাযোগ না থাকায়, এই উপজাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। এই বিপুল নির্মাণকাজ উপলক্ষে বাইরে থেকে তিন লক্ষেরও বেশি মানুষের আগমনের ফলে তাদের থেকে সংক্রমিত নানা রোগব্যাধিতে বিপন্নতার মুখে পড়বে এই উপজাতির মানুষজন।

২০০৪ সালের সুনামি-পরবর্তী সময়ে নিকোবর উপজাতিকে পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কথা দেওয়া হলেও পরে আর তাদের পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এখন তাদের পশ্চিম উপকূলের বাসভূমির ওপরই গড়ে উঠতে চলেছে বিশালাকার প্রকল্প। কাজেই নিকোবর জনজাতির ভবিষ্যৎ নিয়েও সংশয় থেকে যাচ্ছে।

শুধু কি জনজাতি! নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রকৃতির উপরেও নেমে আসতে চলেছে ভারতসাম্যহীন উন্নয়নের কুফল। জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, ২০ হাজারের বেশি কোরাল কলোনি রয়েছে ওই উপকূলবর্তী অঞ্চলে। রয়েছে লেদারব্যাক প্রজাতির কচ্ছপের ডিমপাড়ার সংরক্ষিত অঞ্চল। এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ জন্মের পর যেখানেই যাক না কেন, ডিম পাড়তে ফিরে আসে সেই জায়গায়, যেখানে তাদের জন্ম হয়েছিল। ভারতে ওদের সবচেয়ে বড় প্রজননস্থল এখনকার গালাখিয়া সমুদ্রতট। নিকোবরে এই প্রকল্প হলে হয়তো চিরতরে হারিয়ে যাবে প্রবাল প্রাচীরগুলি, ধ্বংস হয়ে যাবে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সহ বহু দুপ্রাপ্য বৃক্ষ। প্রায় দশ লক্ষ গাছ কাটা হতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান।

২০২৩ সালে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি

এই প্রকল্পটিকে ছাড়পত্র দেয়। প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়ন করা হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তরফ থেকেও। তাতে বাতিল করা হয়েছে বহু বছর ধরে চালু থাকা ইউনেস্কোর সুরক্ষা কবচ। যদিও ভারতের পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-র ৩ নং ধারা অনুযায়ী কোস্টাল রেগুলেশন জোন-১-এর অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল এলাকায়, যেখানে ম্যানগ্রোভ, প্রবাল প্রাচীর এবং কচ্ছপের ডিম পাড়ার স্থান প্রভৃতি রয়েছে সেখানে কোনও রকম নির্মাণ কাজ চালানো সম্ভব নয়। তবুও এমনই তালিকার অন্তর্ভুক্ত গ্যালাখিয়া উপকূলে বেআইনিভাবে চলবে এই নির্মাণকার্য।

প্রশ্ন উঠছে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় প্রকৃতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষের বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা সত্ত্বেও এই প্রকল্প সরকার অনুমোদন করল কার স্বার্থে! দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে, না কি উন্নয়নের নামে বিশেষ একটি পুঁজিগোষ্ঠীর মুনাফা-লুটের স্বার্থে? কারণ, গ্রেট নিকোবর প্রকল্পটি রূপায়ণের মূল দায়িত্ব একটি সরকারি কর্পোরেশনের হলেও শোনা যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ একচেটিয়া শিল্পপতি আদানি গোষ্ঠী এই প্রকল্পের বেশ কয়েকটি পরিকাঠামো নির্মাণের বরাত পেতে চলেছে। ফলে ‘দেশের স্বার্থ’ যে আসলে কাদের স্বার্থ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বিশ্ব উষ্মায়নের কারণে প্রকৃতির রুদ্ররূপে মাঝে মাঝেই অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর মুখে পড়ছে, তাদের জীবনে বিপর্যয় নামছে। ফলে গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের জন্য লক্ষ লক্ষ গাছ কাটার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন পরিবেশবিদ, সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। নিকোবরের মতো সংবেদনশীল ও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে যে কোনও ধরনের ভারী নির্মাণকাজই অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেই বিপদ অগ্রাহ্য করে, আদি বাসিন্দা জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের জীবন বিপন্ন করে এবং বিপুল অরণ্যসম্পদ ধ্বংস করে ঘনিষ্ঠ পুঁজিগোষ্ঠীর মুনাফা-লুটের যে ব্যবস্থা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার করছে, তা শুধু ভারতবাসীর প্রতিই নয়, গোটা মানবসভ্যতার প্রতিই গুরুতর অপরাধ।

জীবনাবসান

দলের বীরভূম জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য ও নলহাটি লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রবীণ কমরেড সিরাজউদ্দৌল্লা ২৯ আগস্ট সকালে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।



কমরেড সিরাজউদ্দৌল্লা ১৯৭০ সালে ছাত্রাবস্থায় স্কুল কর্তৃপক্ষের একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন প্রয়াত নেতা কমরেড জিয়াউল আলী বক্কীর মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। তখন থেকেই এলাকায় নানা ধরনের সাংগঠনিক কাজে নিয়মিত ভূমিকা গ্রহণ করতেন। পরবর্তী সময়ে মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন, রিক্সা-ট্রলি ইউনিয়ন, নলহাটি পাথর শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে ভূমিকা নিতেন। জেলার বিভিন্ন আন্দোলনে, নির্বাচনী লড়াইতে ভূমিকা পালন করেছেন। দলের নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং সাধারণ মানুষের নানা সমস্যায় তাদের পাশে থাকতেন। সততা, সাহসিকতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর বাড়িতে পার্টিকর্মীদের যাতায়াত ছিল অবাধ এবং তাতে তিনি খুশি হতেন। শারীরিক কারণে আগের মতো সক্রিয় না থাকতে পারলেও দলের প্রতি আনুগত্য অটুট ছিল।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কর্মী-সমর্থক, দরদি ও এলাকার বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আয়েষা খাতুন, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড গোলাম মুজতবা। নলহাটি, লোহাপুর, রামপুরহাট, মুরারই, হাঁসন ও নলহাটি-২ নং লোকালের কমরেডরা উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড সিরাজউদ্দৌল্লা লাল সেলাম

অগ্নিকাণ্ডে একের পর এক মৃত্যু প্রশাসনিক অবহেলার কারণেই

একের পর এক অগ্নিকাণ্ড—মৃত্যু, হাহাকার! আজ তারাপীঠ, তো দু’দিন পর কলকাতা! সে হতে পারে হাসপাতাল কিংবা হোটেল বা বাজার। যেখানে বহু মানুষ একসঙ্গে থাকেন, সময় কাটান, সেখানে অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনা বারবার ঘটে চলেছে। মানুষের সুরক্ষা বা নিরাপত্তার করণ চিত্র বার বার এই সব ঘটনায় ফুটে উঠছে। সময় গড়িয়ে যায়, সুরাহা মেলে না। তাই বলে কিছুই কি হয় না? কমিটির পর কমিটি গঠিত হয়। উচ্চ পর্যায়, তারও উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন হয়। সেগুলো দু’দিন নামমাত্র সক্রিয় থাকে। তারপর যেখানের জল সেখানেই থাকে, গড়ায় না। আবার একটা ঘটনা ঘটে। আবারও বেশ কিছু দুর্মূল্য প্রাণ অকালে বাড়ে যায়। সে বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা করাতে আসা ছোট শিশু সহ সাংবাদিকের পরিবার হতে পারে কিংবা বিহার

থেকে আসা তরুণ, যে অন্য চাকরি না পেয়ে হোটেলের কাজ নিয়েছিল এবং এই পেশাতেই কঠোর পরিশ্রম দিয়ে, সততা দিয়ে জীবনে দাঁড়াতে চেয়েছিল—তাদের স্বপ্ন, জীবন পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

২০১১ সালে ৯ ডিসেম্বর ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালে এ ভাবেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯৩ জনের মৃত্যু ঘটেছিল। পাশের বস্তির সেই ছন্নছাড়া মানুষগুলো, যাদের এই রাষ্ট্র সমাজের ময়লা বা জঞ্জাল মনে করে, তারাই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছিল। বড় অগ্নিকাণ্ডের পর সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে ফায়ার অডিট করবার কথা ফলাও করে ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে তা কতটা কার্যকরী হয় ঘোষণাকারী সরকারি মন্ত্রী-নেতারা জানেন। জানা যাচ্ছে ফায়ার অডিট করবার মতো

লোকই নাকি দপ্তরে নেই। স্বয়ং দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী এ কথা স্বীকার করে বলছেন, এরপর অন্তত যাতে নিয়মিত অডিট হয় তা তাঁরা দেখবেন। কিন্তু তাঁরা কি ভরসার সাথে এ কথা বলতে পারবেন যে, এরপর এই মর্মান্তিক ঘটনা আর ঘটবে না কিংবা যাতে না ঘটে তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেওয়া হবে? নাগরিকদের সুরক্ষা গ্রহণে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তাঁরা কি আন্তরিক ভাবে তৎপর হবেন? সে ভরসা অবশ্য রাখা মুশকিল। কারণ বিভিন্ন মহল থেকে একটা কথা ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সরকারের লোক না থাকলে আউটসোর্সিং করে বেসরকারি কোম্পানিকে দায়িত্ব দিক সরকার। অর্থাৎ দমকল দপ্তরের শূন্যপদ পূরণ না করে জনস্বার্থকে বাজি রাখা হবে বেসরকারি মালিকদের কাছে! এ ক্ষেত্রে টাকা যে আসল কথা বলেবে তা জানাই আছে।

ফলে সরকার এবং তাঁর মন্ত্রী পারিষদরা নিরাপত্তার গ্যারান্টি কি সাধারণ নাগরিকদের দিতে আদৌ আন্তরিক? অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, না। এর কোনওটাই সম্ভব হবে না, যদি না এর পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা নেওয়া না হয়। ঘটনায় জানা যাচ্ছে, দুর্ঘটনাস্থলে বিপদজনক বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগ, অপরিষর যাতায়াতের রাস্তা, উপযুক্ত

অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা না থাকা এবং সময়মতো দমকল না পৌঁছনো। বেআইনি ভাবে, প্রোমোটর বা নেতাদের টাকা খাইয়ে ঝুঁকি নিয়েই দিনের পর দিন রমরমিয়ে চলছে নানা ব্যবসা। সেই ব্যবসাদারদের থেকে শাসক দলগুলির তহবিলে মোটা অঙ্কের চাঁদা চলে আসে। বেআইনি জেনেও ছোট বড় নেতারা পারমিশন দিয়ে দেয়। এই চক্রের মানুষের জীবন বিপন্ন জেনেও তা চলতে দেওয়া হচ্ছে। কোনও কমিটিতে তাই কোনও সুরাহা হয় না। দুর্ঘটনায় বারবার উঠে আসে দমকল বাহিনীর দুরবস্থার কথাও। দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ। জল আছে, পাইপ লাইন আছে কিন্তু গাড়ির চালক নেই, কর্মী নেই। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার এই ছিদ্রগুলো না সারালে কমিটি গঠনই সার হবে। সরকারি নেতারা কুস্তীরাশি বারাবেন, নানা প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু কাজের কাজ হবে না। সাধারণ মানুষের জীবনে হঠাৎ করেই এ ভাবে নেমে আসবে অন্ধকার। কোথায় কোন মারণফাঁদ পাতা আছে কেউ টের পাওয়ার আগেই স্বজন হারিয়ে যাবে আমার আপনার। নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিপর্যস্ত হবে, যদি দুর্নীতি, তোলাবাজি, কাটমানি খাওয়া চিরতরে বন্ধ না হয়।

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : ফিরে দেখা (২)

‘হিন্দু’ একটি বিদেশি শব্দ !

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা ভারতের ইতিহাসকে ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ পর্বে যে ভাবে ভাগ করেন, সেই বিভাজনটা ছিল কৃত্রিম, ঔপনিবেশিক লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া।

ইতিহাসের এই কৃত্রিম বিভাজনের মধ্যে দিয়েই ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়রা এক জাতি— এই সত্যের পরিবর্তে হিন্দু এবং মুসলমান আলাদা আলাদা জাতি— এই অনৈতিহাসিক ধারণার উদ্ভব। সত্যিই কি এই সময়কালকে হিন্দু এবং মুসলিম— এমন ধর্মভিত্তিক যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়?

খ্রিস্টপূর্ব ১০০ সাল থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে সাধারণত হিন্দুযুগ বলা হয়। যদি রাজত্বের অর্থও ধরা হয় তবে এর মধ্যে একটা দীর্ঘ সময় কি মৌর্য, ইন্দো-গ্রিসীয়, শক, কুষাণ রাজারা রাজত্ব করেননি? তাঁরা তো হিন্দু ছিলেন না! অনেক রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ। এই যুক্তিতে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় তো বৌদ্ধযুগ! অথচ এই ইতিহাসবিদরা বৌদ্ধযুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

ব্রিটিশ কিংবা তাঁদের অনুসারী এ দেশীয় ইতিহাসবিদরা এই সময়টিকে ‘হিন্দুযুগ’ বললেও এ দেশের সেই সময়কার মানুষরা কি নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন? এ দেশে মুসলমান রাজত্বের আগেকার ভারত সম্পর্কে ইতিহাসের যে উপাদান পাওয়া যায়, সেখানে কোথাও হিন্দু কথাটি পাওয়া যায় না। এমনকি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বলে পরিচিত রামায়ণ, মহাভারত বা গীতাতেও কোথাও ‘হিন্দু’ শব্দটির উল্লেখ নেই। ইতিহাস বলছে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পারস্য সম্রাট প্রথম দরায়ুসের লিখনে সিন্ধু উপত্যকাকে ‘হিন্দু’ বা ‘হিন্দুস’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পারসিক শব্দ অনুকরণে গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস ‘হিন্দিক’ এবং পরবর্তী গ্রিক লেখকরা ‘ইন্ডিকা’ বা ‘ইন্ডিয়া’-র মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। সিন্ধু থেকে আসা ‘হিন্দুস’ বা ‘ইন্দোস’ শব্দের সঙ্গে ভূখণ্ডবাচক পারসিক প্রত্যয় তান (যেমন উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান) যুক্ত করে হয়েছে হিন্দুস্তান এবং গ্রিক রোমান জগতের প্রত্যয় ইয়া (যেমন সিরিয়া, সার্বিয়া) যোগ করে তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া। অর্থাৎ হিন্দু শব্দটি গোড়ায় হিন্দুরা নিজেরা ব্যবহার করেনি। বাস্তবে এটি একটি বিদেশি শব্দ, যা পরে হিন্দুরা গ্রহণ করেছে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি থেকে স্পষ্ট হয়, মুসলমান যুগের আগেকার ভারত বলে পরিচিত ভূখণ্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলি নিজেদের হিন্দু বা কোনও ঐক্যবদ্ধ ধর্মসম্প্রদায় বলে মনে করতেন না। বৌদ্ধদের ধর্মীয় সংগঠনের রূপ হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্বের সময়কে কোনও ভাবেই হিন্দু যুগ বলে অভিহিত করা যায় না।

ভারতে মুসলিম যুগের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে এখন আরব, তুর্কি এবং পারসিক সকলকেই এক সঙ্গে ‘মুসলমান’ বলা হয়। অথচ

সমসাময়িক যে সব গ্রন্থ থেকে সেই যুগের বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলিতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান শব্দের ব্যবহার বিরল। এই সব গ্রন্থে ধর্মীয় পরিভাষার পরিবর্তে রাজনৈতিক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তুরস্কের লোকদের তুর্কী, আরবদের যবন বলা হত। অবশ্য পশ্চিম এশিয়া বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসা গ্রিক, রোমান-আরব নির্বিশেষে সকলকেই যবন বলার রীতি ছিল।

ব্রিটিশ এবং তার অনুগামী সব ইতিহাসবিদরা মুসলিম শাসকদের সময়টিকে হিন্দুদের উপর মুসলিমদের অত্যাচারের এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করার যুগ হিসাবে চিত্রিত করেন। অর্থাৎ দুই ধর্মের মানুষকে পরস্পরের শত্রু হিসাবেই তুলে ধরেন। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা কতখানি?

তুর্কি শাসন থেকে শুরু করে অন্য মুসলিম শাসকদের ভারত অভিযানের প্রথম স্তরে সংঘর্ষ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অত্যাচার— এগুলো সেই সময়কার রাজ্যজয়ের অন্যুষ্ট হিসাবেই দেখা দিয়েছিল। ক্ষমতা দখল সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক এই বিশৃঙ্খলা যেমন স্বাভাবিক ভাবেই ধীরে ধীরে কমে আসে, তেমনই শান্তি এবং শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করাটা শাসকদের স্থায়ী শাসন গড়ে তোলার জন্যও দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত রাজ্য দখল সম্পূর্ণ হলে স্থানীয় ক্ষমতাশালী শাসকদের পরাজিত করার পর সেই শাসকদের নিচের স্তরে যাঁরা থাকতেন, মূলত জমিদার শ্রেণির লোকদের সাথে সুলতানরা একটা রফা করতেন। কারণ তখনই বিকল্প নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জমিদাররা সুলতানকে একটা কর দিয়ে তাঁদের জমি, পদমর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা সবই রাখতে পারতেন। এই ভাবে শাসনব্যবস্থার নিচের স্তরে স্থানীয় হিন্দুদেরই শাসন থেকে যায় এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাসও হ্রাস পেতে থাকে। এই অংশের শাসকদের সঙ্গে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে সুলতান-নবাবদের কখনও বিরোধ দেখা দিলে তাকে প্রায়ই ধর্মীয় রূপ দিয়ে দেখানো হত। মনে রাখতে হবে, যুদ্ধে রাজ্য জয়, তা হিন্দু শাসক বনাম মুসলিম শাসক হোক কিংবা মুসলিম শাসক বনাম মুসলিম শাসক বা হিন্দু শাসক বনাম হিন্দু শাসক, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব যুদ্ধের ক্ষেত্রেই হত্যা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, লুণ্ঠপাট প্রভৃতি বিষয়গুলি একই থাকে। বাবর দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেন। শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন ভারত ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও হত্যা করেন। প্রতিটি যুদ্ধেই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন রয়েছে। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধে যে রক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল তা বহুল প্রচলিত। এ সত্ত্বেও যাঁরা মুসলিম শাসকের বিজয়ে শুধু বর্বরতা দেখেন এবং হিন্দু শাসকের বিজয়ে শৌর্যবীর্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না, তাঁদের

বিচার ইতিহাসম্মত নয়।

সারা দেশেই, বিশেষ করে বাংলায় মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু, হিন্দুরা সংখ্যাগুরু। তাই কেবল তরবারি তথা ক্ষমতার জোরে হিন্দুদের ধর্মান্তরণ সহজ ছিল না। যদিও শাসন ক্ষমতার জোরে ধর্মান্তরণের ঘটনা কম ছিল না। তবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও প্রধানত নিম্নশ্রেণির মানুষদের ধর্মান্তরণই বেশি ঘটেছে। নিম্নবর্গের মানুষের ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণই এই ধর্মের প্রসারের অন্যতম কারণ বলা যায়।

মনে রাখতে হবে, এর আগে যারা ভারত আক্রমণ করেছে, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশিরা, তারা সভ্যতার দিক থেকে ভারতীয়দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ছিল। সেই জন্যই হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে তারা সহজেই মিশে গিয়েছিল। মুসলিম ধর্মের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কারণ ইসলাম ছিল এক নবীন ধর্ম, যা শ্রেণিগত, জাতিগত, বংশ ও বর্ণভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য বাতিল করে এমন এক ধর্মীয় সম্প্রদায় স্থাপন করে যেখানে সকল অনুগামীর মধ্যে সমতা বিরাজ করে।

অন্য দিকে হিন্দু সমাজে ছিল বর্ণাশ্রম। ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও অস্পৃশ্যতার রীতি নিম্নবর্ণের মানুষের উপর চেপে বসেছিল। তা ছাড়া, ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মণধর্ম কোনও সময়ই দৃঢ় রূপ নিতে পারেনি। পালযুগের উদারবাদী শাসনের পর সেন আমলে ব্রাহ্মণধর্মের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধরা নিগ্রহের শিকার হয়েছিল। তাই সামাজিক উৎপীড়ন এড়াতে নিম্নশ্রেণির লোকেরা ইসলামকে স্বাগত জানান। সমাজে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত মানুষের কাছে ইসলাম তার সমতার বাণী নিয়ে সামাজিক বাধানিষেধ ও নিগ্রহ থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে উপস্থিত হয়। বিবেকানন্দ ভারতে মুসলিম শাসনের প্রভাব সম্পর্কে মাদ্রাজে ‘ভারতের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, “এমনকি মুসলিম শাসনের কাছেও আমরা সেই মহান আশীর্বাদের জন্য ঋণী, যা হল বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান। ... ভারতের মুসলিম বিজয় দলিত ও দরিদ্রদের কাছে একটি পরিব্রাণ হিসেবে এসেছিল। আর এই কারণেই আমাদের জনগণের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মুসলিম হয়েছে। শুধু তলোয়ারের জোরেই এটি হয়নি। এটি সম্পূর্ণ ভাবে তলোয়ার এবং অগ্নিসংযোগের কাজ ছিল বলে মনে করাটা হবে চরম উদ্ভ্রান্ত।”

শাসকরা যে কখনও ব্যাপক ভাবে সব হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, বা প্রচণ্ড উৎসাহে ইসলামি আদর্শ প্রচার করেছিলেন, এ রকম প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র সেই সব ব্যক্তিদেরই ধর্মান্তরের কথা উঠত যাঁরা হয় বিদ্রোহ করেছেন অথবা রাষ্ট্রের বিরোধিতা বা অনুরূপ কাজ করেছেন। তাই দেখা যায়, তুর্কি সুলতান বা মোগল রাজসভায় বা সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে বহু হিন্দু কর্মরত ছিলেন। মুসলিম শাসকরা যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ নিয়ে চলতেন তবে শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে হিন্দুদের এ ভাবে নিয়োগ করতেন না। মোগল শাসনে বহু হিন্দু উচ্চপদে আসীন ছিলেন। বাংলায়ও সুলতান হুসেন শাহের শাসনের সময়ে তাঁর প্রশাসনের দুই স্তম্ভ ছিলেন

ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত ও মহাকবি সনাতন এবং তাঁর ভাই রূপ, যাঁরা পরে শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সিরাজউদ্দৌল্লাহর দরবারে রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদরাও উচ্চপদে ছিলেন। একই রকম ভাবে মোগলদের সঙ্গে প্রতাপসিংহের যুদ্ধে প্রতাপের পক্ষে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান যোদ্ধা কম ছিলেন না। মোগলদের পক্ষেও মুসলমানের চেয়ে হিন্দু অল্প ছিলেন না।

পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশো বছরেও সমাজ জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বা ধর্মকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা প্রায় ছিল না। বরং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের শক্তির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। যেমন সিপাহিদের মধ্যে তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নেমেছিল।

অন্য দিকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদণ্ড পরস্পরের সহযোগী হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহ-কে, যিনি মুসলমান ছিলেন, সবার সম্রাট বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি। হিন্দু ও মুসলিমরা পরস্পর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চললে এটা হত কি? বিদ্রোহের বিভিন্ন স্তরে নেতা-নির্বাচনের কালে লক্ষ রাখা হত যাতে উভয় সম্প্রদায়েরই যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান হয়। বিদ্রোহের সময়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ঘটনা যে বাস্তব ছিল সেটা ইংরেজদেরও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। পরে এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী আফসোস প্রকাশ করে লিখেছিলেন, ‘এই একটা উপলক্ষ্য, যেখানে আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের খেপিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।’ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে মধ্যযুগ এবং অন্তত ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না।

কানপুরে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেব। নানা সাহেবের এক বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন আজিমুল্লাহ। লক্ষ্মীর বিদ্রোহ অযোধ্যার বেগমের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ছিলেন ঝাঁসির তরুণী রানি লক্ষ্মীবাই। লক্ষ্মীবাইয়ের ব্যক্তিগত রক্ষী হিসেবে প্রধানত দুই আফগান (পশতুন) ভাই, গুল মোহাম্মদ খান ও কাসিম খান দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রানির সেনাবাহিনীতে প্রায় ৫০০ জন আফগান পাঠান সৈন্য ছিল, যারা ইতিহাসে ‘ওয়ালয়াতি’ (Walayatis) নামেও পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়াও রানির অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রধান সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুন্ডার খাতুন (বা মুন্ডার বাই)। তিনি ছিলেন রানীর ঘনিষ্ঠ মুসলিম মহিলা দেহরক্ষী ও সহচরী, যিনি গোয়ালিয়রের যুদ্ধক্ষেত্রে রানির সাথেই বীরত্বের সাথে লড়াই করে প্রাণ দেন। গোলাম গৌস খান ছিলেন ঝাঁসি দুর্গের প্রধান গোলামদাজ বাহিনীর প্রধান। খুদা বক্স ছিলেন রানির রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান। সমাজে ধর্মের বিভেদ থাকলে এ সব সম্ভব হত কি!

তবে এই বিদ্রোহে সবচেয়ে বীরত্বের সম্মান সিপাহিদেরই প্রাপ্য। গভীর স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় এরা নিজেদের মধ্যে বন্ধমূল পরধর্ম বিদ্বেষকেও

আটের পাতায় দেখুন

প্রয়াণের অর্ধশতবর্ষে নজরুল স্মরণ

২৯ আগস্ট কলকাতায় বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলামের অর্ধশত প্রয়াণ-বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নজরুল ইসলামের বক্তব্য সংবলিত প্রতিকৃতি হাতে পদযাত্রা সহ স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে 'নজরুল ইসলাম অর্ধশত প্রয়াণ বর্ষ স্মরণ কমিটি'। কলেজ স্কোয়ারে নজরুল সহ বিপ্লবীদের স্মৃতি বিজড়িত ফেডারিট কেবিনের সামনে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নজরুল বিশেষজ্ঞ ডাঃ শঙ্কর নাথ। পদযাত্রায় পা মেলান কয়েকশো মানুষ। মহাজাতি সদন সেমিনার হলে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাওন নন্দী এবং বিশিষ্ট প্রবন্ধকার কমল সাঁই। বিশিষ্ট কবি শুভ দাশগুপ্ত অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে না পেরে লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেন। প্রকাশিত হয় 'নজরুল উদ্ধৃতি : তবু আমরা দেব না ভুলিতে'। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মনোজ গুহ, অধ্যাপক মহালয়া চ্যাটার্জী,



অধ্যাপক পঞ্চানন হালদার, ডাঃ দীপনারায়ণ দত্ত, অধ্যাপক তরুণ দাস, ডাঃ অরুণাভ সেনগুপ্ত, ডাঃ তরুণ মণ্ডল সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। সারা রাজ্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার কৃতিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীরা। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ সামস মুসাফির ও অনিন্দিতা জানা নজরুলের সৃষ্টি ও তাঁর চিন্তাচেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে সকলকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সরকারি স্কুল বাঁচানো ও স্কুলে পানীয় জল, শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলবাড়ি সংস্কারের মতো বিনিয়াদি পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিতে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে আন্দোলনে নেমেছে ছাত্রছাত্রীরা। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে শুরু করে স্কুলছাত্রীরাও হোস্টেল ও মিড ডে মিলে নিম্নমানের খাবার, বাসভাড়া বৃদ্ধি, স্কুল মার্জারের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। ভোপাল, অশোকনগরে জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করে ছাত্ররা। নানা জায়গায় পথ অবরোধ করে তারা। বিজেপি সরকার ছাত্রদের ওপর জুলুম করে, শিক্ষক-অভিভাবকদের হুমকি দিয়েও আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই



আন্দোলনের পথেই গড়ে উঠেছে 'স্কুল বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি'। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে রাজ্যস্তরীয় কনভেনশনের মাধ্যমে ২৩ আগস্ট সমিতিকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়। ভোপালের নীলম পার্কে (ছবি) এই কনভেনশনে রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

সংবাদপত্র দফতরের সামনে বিক্ষোভের তীব্র প্রতিবাদ

১ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসের সামনে গেরুয়া বসনধারী একদল যুবকের বিক্ষোভের প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন, আনন্দবাজার অফিসের সামনে গেরুয়া বসনধারী একদল যুবক যে ভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, দেওয়ালের একটি অংশে গেরুয়া রঙ লাগিয়েছে, তা সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টার সামিল। মুখ্যমন্ত্রী কয়েক দিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি-র তাণ্ডবের উপর একটি সংবাদের প্রেক্ষিতে এই পত্রিকাকে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। এই বিক্ষোভের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।
যে সংগঠনই এই কাজ করুক, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

‘হিন্দু’ একটি বিদেশি শব্দ !

সাতের পাতার পর

বলি দিয়েছিল। একদিন তারা ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে চর্বিযুক্ত টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু ঘৃণিত বিদেশি শব্দকে দেশ থেকে বিতাড়নের প্রয়োজনে বিদ্রোহের সময়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সিপাহিরাই এই টোটা বিনা আপত্তিতে ব্যবহার করেছিল। ১৮৫৯-এর মধ্যে ভারতের সর্বত্রই ব্রিটিশরাজ পূর্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। শৈর্য ও দেশাত্মবোধ এবং সস্ত্রীতির বোধে সমুজ্জল ১৮৫৭-র এই মহাবিদ্রোহ ভারতবাসীর মনে একটা অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গিয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল।

আজকের বিজেপি-আরএসএস নেতারা দেশের একচেটিয়া পুঁজির নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের প্রতিবাদী ঐক্যকে ভাঙতে দেশের এই গৌরবময় সস্ত্রীতির ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে চায়। তারা দেখাতে চায়, দেশটা শুধুই হিন্দুদের, মুসলমানরা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। বাস্তবে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া তাঁদের রাজনীতিতে আর এমন কিছু নেই যা দিয়ে তাঁরা আজ দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তার জন্য তাঁরা ইতিহাসকে বিকৃত করছেন, মিথ্যা ইতিহাস দেশের ছাত্রদের সামনে তুলে ধরছেন। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মোকাবিলা করতে হলে সস্ত্রীতির রাজনীতিকে তুলে ধরতে হবে। তার জন্য দেশের সস্ত্রীতির ইতিহাস জানা খুবই জরুরি। (চলবে)



শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এআইভিএসও-র ডাকে বিশাল ছাত্র সমাবেশের একাংশ